গৌতম বসু

রাবণ

পূর্বসূরিদের প্রভাব সম্বন্ধে মধুসূদন কোনো গোপনীয়তা অবলম্বন করেননি। কলেজপাঠ্য সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে বিদগ্ধতম প্রবন্ধটি, সবই তাঁর পত্রের সূত্র ধরে এগিয়েছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সার্থকতা-বিষয়ে তাঁর যদি কোনো ভীতি থাকত, কোনো সংশয় জাগতো রাবণের মৌলিকত্ব-প্রসঙ্গে, তাহলে বলা বাহুল্য, তিনি নিজেকে গোপন করতেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি ঋণস্বীকারে তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না, এর একটি কারণ হয়তো এই যে, তাঁর মূল ছিল স্বাদেশিকতায় প্রোথিত।

সাম্প্রতিক কালে মধুসূদনের বিরুদ্ধে তীব্রতম, এবং বোধ করি, নিষ্ঠুরতম আক্রমণ প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ('কবিতা', প্রবন্ধের শিরোনাম 'মাইকেল,' অস্বাক্ষরিত, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৫৩, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৩)। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার যে অভিযোগগুলি জনপ্রিয়, ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই মধুসূদনপন্থীদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এক গোষ্ঠীর বিচারে মধুসূদনের যে প্রচেষ্টা বিদেশি ও কৃত্রিম, অন্য গোষ্ঠীর বিবেচনায় সে-অবস্থাই বাংলা কবিতার তৎকালীন বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতপ্রতিম। অর্থাৎ, তাঁর তথাকথিত পাশ্চাত্য মনকে দুটি গোষ্ঠী দুটি দিক থেকে লক্ষ করছেন; তাঁদের সিদ্ধান্তও, স্বভাবতই ভিন্ন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবের মূল প্রসঙ্গের ভিত্তিই দুর্বল বলে সন্দেহ হয়, মধুসূদনের বিদেশিয়ানা যেন তাঁর জীবনধারণপ্রণালী তথা পত্রগুচ্ছ থেকে গঠিত। কথিত আছে, অনুকরণদোষে অভিযুক্ত হওয়ায় ভার্জিলের প্রতিক্রিয়া ছিল তাচ্ছিল্যপূর্ণ। হোমারের রচনা আত্মসাৎ অপেক্ষা হারকিউলিসের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়াও সহজসাধ্য, ভার্জিলের এই রসিকতা যেন মধুসূদনেরও হতে পারত।

মিল্টনের শয়তান অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর চেতনাপুষ্ট মানুষ, রাবণ এর কোনোটাই নন, তিনি এক তেজস্বী প্রৌঢ়। মেঘনাদ তাঁর ক্রুদ্ধ অংশ, নিয়তির বিরুদ্ধে রাবণের ক্রোধের পরিণতি আমাদের অজানা নয়। সর্গ থেকে সর্গে অগ্রসর হতে হতে আমরা লক্ষ করি তাঁর ঐশ্বর্যের ও গৌরবের স্খলন, তাঁর 'বিপুল কুল-মান'-এর অহঙ্কার কীভাবে ধীরে ধীরে ধুলোয় অবলুণ্ঠিত হতে চলেছে, এক বিলাপ থেকে পরবর্তী বিলাপে তার অনিবার্য পথপরিক্রমা। রাবণ চরিত্রের মূল গতি নিম্নমুখিতা;

শূর্পণখার অসম্মান, সীতাহরণ প্রভৃতি তুচ্ছ ঘটনামাত্র যা নিঃসন্দেহে রাবণের সর্বনাশ বিশেষ খাতে বইয়েছে, কিন্তু সর্বনাশের প্রকৃতি স্পর্শ করা যাদের উদ্দেশ্য নয়।

রাবণ এক শীর্ষে অবস্থান করছিলেন কিন্তু কাল বহমান; স্বভাবত, ঊর্ধ্বগতি-অধোগতির প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি আবদ্ধ। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে তিনি এমন কোনো কাজ করতেনই যার ফলাফল তাঁর অহংকার চূর্ণ করত। বস্তুত, পতনের কারণসম্বন্ধ এখানে একান্ত গৌণ, সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনাবলির দ্বারা রাবণের পরিণতি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল। মাটি থেকে উঠে আসা সীতার মাটিতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তিতায় বাল্মীকি এক প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে রূপ দিয়েছিলেন, রামচন্দ্র সেখানে প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতিকে অনুসরণরত এক মানুষ, সংখ্যাহীন দুঃখভোগের ভিতর ধর্মবোধ যার একমাত্র অবলম্বন। মধুসূদন বাল্মীকিকে ঘুরিয়ে দেখেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কোণ থেকে নয়, রাবণের ভিতর তিনি অহংকারনাশের সন্ধান পেয়েছিলেন। শূর্পণখার লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তরে সীতাহরণ এক স্বাভাবিক পদক্ষেপ, অন্তত রাবণের পক্ষে, কিন্তু কী মর্মান্তিক হয়ে উঠল তাঁর বলপ্রদর্শন। মেঘনাদের মৃত্যু তাঁর নিজের মৃত্যুরও অধিক, কারণ এ এমন এক ক্ষতি যা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন, যা তাঁকে জীবন্মৃত রেখে যায়।

২.

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবার সময় নিজ সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণে কোনো গভীর তাৎপর্য ছিল না, মধুসূদনের অভিজ্ঞতায় তা ছিল কেবল এক আবেগী প্রতিক্রিয়া। এই সময় থেকেই কিন্তু রামায়ণের প্রথানুগ পাঠ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছিলেন। দক্ষিণ ভারত, আপন সংস্কৃতি থেকে তাঁকে প্রার্থিত ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্ব দিয়েছিল। বাল্মীকি-রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতির পর সম্ভাবনাময় চরিত্র হিসেবে রামচন্দ্র যে নিঃশেষিত, মধুসূদনের তীক্ষ্ণ মনন সেটা সহজে উপলব্ধি করেছিল, এবং করেছিল বলেই তার পক্ষপাত হয়ে উঠেছিল অন্য চরিত্রের সন্ধানী। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, রাবণকে পুনরাবিষ্কার করার আদিসূত্র মধুসূদন মাদ্রাজের দ্রাবিড় পরিমণ্ডল থেকে পেয়েছিলেন। মাদ্রাজপর্বের পত্রে রামায়ণ মাত্র একবার উল্লিখিত, কিন্তু সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। গৌরদাস বসাককে রামায়ণ পাঠাবার অনুরোধের মধ্যে সাময়িক পরিত্যক্ত সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের ভাব প্রবাহের প্রতিতুলনার ইঙ্গিত রয়েছে। মাদ্রাজ-প্রবাস ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার মধ্যে দুস্তর কালগত ব্যবধান স্বাভাবিক; দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিশ্রমে দ্রাবিড়ীয় রাবণ, মধুসূদনীয় রাবণে রূপান্তরিত হয়েছে।

এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, মধুসূদনের কোনো পাশ্চাত্ত্য পশ্চাদপট ছিল না। দ্রাবিড়ীয় মানসিকতা ও ভার্জিল-মিল্টনাদির লিখনভঙ্গিমা উভয়ই রাবণ-চরিত্রের অপ্রধান উপাদান, প্রথম থেকে শেষ সর্গ পর্যন্ত রাবণ মধুসূদনের একান্ত দৃষ্টি। বস্তুত,

উত্তর-ভারতীয় ঐতিহ্যের কয়েকটি দিক প্রশমিত করার বাইরে মধুসূদন বিষয়ে দক্ষিণ ভারতের আর কোনো ভূমিকা ছিল না। অনার্য, শৈব, কৃষি-সভ্যতাবিরোধী এক ধনবান যুথপতি— রাবণের এই উত্তর-ভারতীয় কুশপুত্তলি অপসৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্রটির মধ্যে জেগে উঠল বিপুল সম্ভাবনা।

'প্যারাডাইস লস্ট'-এর সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে মধুসূদন শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন যে, মূল চরিত্র যতই প্রথাবিরুদ্ধ হোক, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারলেই সাহিত্যকর্ম সার্থক হবে। ছন্দশিক্ষার বাইরে মিল্টনের কিছুমাত্র প্রভাব যদি মধুসূনের উপর থেকে থাকে, তবে তা এইখানেই সমাপ্ত। রণ ও শয়তান আপাতসদৃশ, প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের মধ্যে প্রভেদই বেশি। তাঁদের নিঃসঙ্গতা সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণসম্পন্ন, শয়তানের নিঃসঙ্গতা তার কর্মফল, পাপবোধশূন্য একাকিত্ব রাবণের অন্যতম ভূষণ। শয়তানের উচ্চাভিলাষজনিত পতনে যে প্রত্যক্ষ ধর্মীয় অনুষঙ্গ রয়েছে, রাবণের প্রাকৃতিক অধোগমনে তা অনুপস্থিত। রাবণের প্রতি স্বর্গের অসন্তোষ সর্বব্যাপী, এমনকী স্বয়ং মহাদেবও তার ব্যতিক্রম নন (২: ৪২৯— ৪৩২), কিন্তু কী রাবণের অপরাধ? লক্ষ্মী রাবণের অর্থকোষ থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশী, ইন্দ্র বিস্মৃত হননি মেঘনাদের হাতের লাঞ্ছনা, দুর্গা রামচন্দ্রের কল্যাণে ব্যাকুল— এমন কৌশলে দেবগণের নিজ-নিজ স্বার্থ প্রকাশ করেছেন মধুসূদন যে তাঁদের বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ নীরবে প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় সর্গে দেবতাদের জাতক্রোধপুষ্ট কূটনীতি ও 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর উদার, প্রায়নির্লিপ্ত ভঙ্গির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। মধুসূদনের দেবতারা প্রকৃত বলশালী, প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-পীড়িত এক-একজন প্রচ্ছন্ন মানুষ। দ্বিতীয় সর্গকে ও অষ্টম সর্গের প্রথমাংশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে দেবতাদের ত্রিকালজ্ঞ, ঘটনার নিয়ন্তা বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সম্পূর্ণ মহাকাব্যের প্রেক্ষিতে তাঁদের মর্যাদা অনুঘটকের বেশি নয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ যে ঈশ্বর আছেন তিনি দেবগণের নেপথ্যে; অগম্য, অনুল্লিখিত এক অন্তরাল থেকে রামচন্দ্র ও রাবণ, উভয়ের ন্যায্য দাবির ভিতর সংঘর্ষ সৃষ্টি করছেন, মারণাস্ত্রদান ও লক্ষ্মণের পুনর্জন্মলাভের জন্য দেবকুল ও রামচন্দ্রের মধ্যে সংযোগস্থাপন তাঁরই পরিকল্পনা, তাঁরই লীলাক্ষেত্রে চরিত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, হতভাগ্য রাবণ অন্তিম বিলাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

মধুসূদন সচেতনে এই মৌলিকত্ব অন্বেষণ করেছিলেন কি না তা আজ নিশ্চিতভাবে জানা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁর অর্জন তাঁকে ইউরোপীয় মহাকবিদের থেকে বহুদূরে স্থাপন করেছে। কোনো দেবতার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করতে তিনি প্রস্তুত নন, তাঁর মহাকাব্যে প্রত্যক্ষ নয়, এক পরোক্ষ নিয়ন্তা রয়েছেন। হোমার থেকে মিল্টন, কোনো পাশ্চাত্ত্য মহাকবি ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তু উত্থাপন করেননি। ফলত, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অষ্টম সর্গের সঙ্গে ঈনীডের ষষ্ঠ সর্গের নরকবর্ণনার

সাদৃশ্য, রাবণ ও শয়তানের তথাকথিত চরিত্রগত মিল ইত্যাদি অপ্রধান বিষয় অনুসরণ করে মধুসূদনকে খর্ব করার প্রচেষ্টা কতদূর গ্রহণযোগ্য— এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে।

মধুসূদনের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে আমরা এ-যাবৎ কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পেয়েছি— প্রথমত, রাবণের পতন, যা মূলত অহংকারের বিনাশ, এক প্রাকৃতিক ঘটনার মতো অনিবার্য; দ্বিতীয়ত, দেবতা ও ঈশ্বরকে মধুসূদন পৃথক করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে প্রত্যেক দেবতাই প্রচ্ছন্ন মানুষ; এবং তৃতীয়ত, মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে এক অদৃশ্য নিয়ন্তা রয়েছেন যিনি স্বর্গ, রামচন্দ্র ও রাবণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণ করছেন। উল্লিখিত সূত্রগুলি একত্রিত করে বলতে পারি যে, ঈশ্বর কোনো চরিত্ররূপে অবতীর্ণ হননি এ-কথা সত্য, কিন্তু তিনিই ঘটনাবলির অদৃশ্য চালক। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভাষায় নামকরণের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; তাঁকে ঈশ্বর নাম না দিয়ে বিধি বলতে পারি যেমন স্বয়ং মধুসূদন বলেছিলেন, অথবা তিনি আমাদের সমকালীন মানসিকতায় মহাকাল কিংবা প্রকৃতির মূর্তি ধারণ করতে পারেন, কিন্তু মূল থাকে অপরিবর্তিত। এইরকম একটি পশ্চাদপটের সম্মুখে মধুসূদনের দুই প্রধান চরিত্র উপস্থিত; রাবণ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেজস্বী কিন্তু অহংকারী, পক্ষান্তরে, রামচন্দ্রের দেবনির্ভরতা, কোমলতা প্রায় দুর্বলতার প্রান্তসীমায়। রাবণের অহংকারের তীব্র সৌন্দর্য মধুসূদনকে আকর্ষণ করেছিল, পশ্চাদপটের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে ধ্বংস চয়ন করে প্রয়োগ করলেন রাবণের উপর। বস্তুত 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের অহংকারের সেই অসম সংঘর্ষের কাহিনি।

৩

অহংকার— কুলের, বলবীর্যের, ন্যায়ধর্মের; বিষয়টি বেদব্যাসকেও গভীরভাবে চিন্তিত করেছিল। মহাভারতের প্রতিটি প্রধান চরিত্র অহংকারাক্রান্ত, প্রত্যেকে মূর্তিমান উজ্জ্বলতা, কিন্তু তাঁদের পরিণতি আমাদের স্তম্ভিত করে— স্বয়ং কৃষ্ণ তুচ্ছ ব্যাধ দ্বারা শরবিদ্ধ, অর্জুনং মৌষলপর্বে সামান্য দস্যুদলকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ, যুধিষ্ঠির স্বর্গে এসে দেখেন 'দুরাত্মা' দুর্যোধন স্বর্গবাসসুখী। মহাভারতকে পরীক্ষায় এমন আকীর্ণ রেখেছেন বেদব্যাস যে একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে কেউ-ই শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারেননি। পাদপ্রদীপের বাইরের এই নিরহংকার দিব্যপুরুষটি যেন অন্য সব চরিত্র বিচারের মানদণ্ড।

এই অবতারণা আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর মনে হতে পারে কিন্তু মহাভারতের দৃষ্টান্তের ভিতরেই নিহিত রয়েছে মধুসূদনের বীজ। অহংকারকে যে নির্মোহ, প্রায় নির্মম চোখে বেদব্যাস দেখেছিলেন, মধুসূদন তেমন দেখেননি। তাঁর চিত্রণ বর্ণময়, উত্তপ্ত, ক্ষুদ্র, পতনপ্রায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিচিহ্নিত। অনুকরণ তিনি করেননি, মহাভারতের বিপুল ঐতিহ্যকে স্বোপার্জিত দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন

মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, বাল্মীকি ও বেদব্যাস উভয়ই মধুসূদনের যথার্থ পূর্বপুরুষ; বাল্মীকি থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন ঘটনার আবরণ, বেদব্যাস থেকে বিষয়ের মেরুদণ্ড। 'ভ্রাতঃ কাল-ই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি'— মহাপ্রাস্থনিক পর্বের আরম্ভে অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তিটির গভীরে ধ্বনিত হয়েছে মহাভারতের নেপথ্য নায়কের কাছে সকল চরিত্রের সমর্পণ। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ সেই একই নায়ক কর্মরত, কিন্তু রাবণ পারছেন না তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে, চরম ব্যর্থতার মধ্যেও নিক্ষেপ করছেন ক্ষমা, কারণ তিনি জানেন রামচন্দ্র উপলক্ষ্যমাত্র, প্রকৃত প্রতিপক্ষকে তিনি এতদিনে চিনেছেন:

'বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরামলক্ষ্মণে।'

(৯:৪১৬-৪১৯)

রাবণের পরাভূত মূর্তির প্রতি শোক অথবা করুণাপ্রকাশ অসম্ভব, কারণ আমরা জানি, তাঁর যুদ্ধ ছিল অপূর্ব।

[জনপদ, বৈশাখ ১৩৯২]